মহাকাশ থেকে প্রলয়ের গল্প

বিমান নাথ

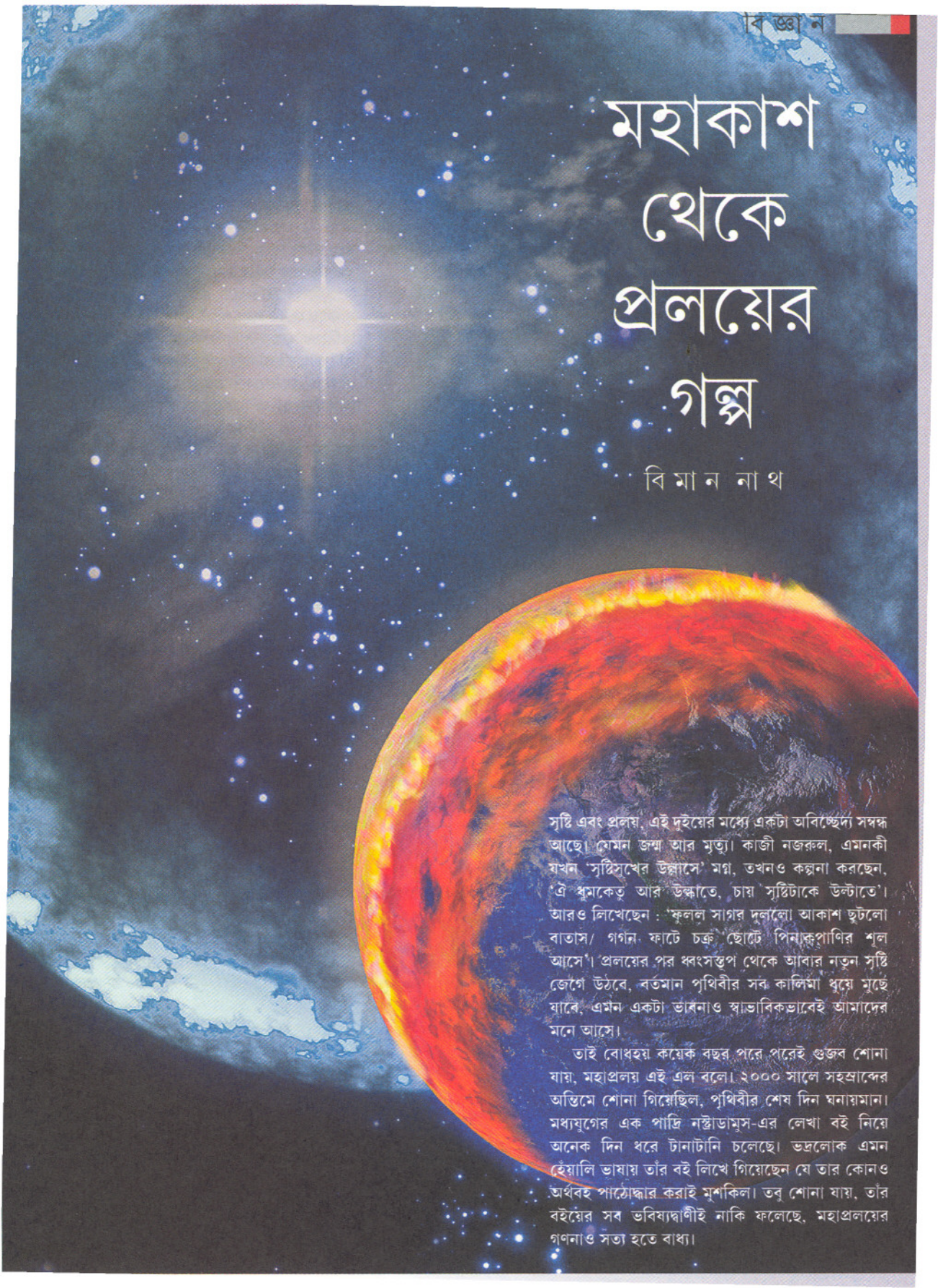

সৃষ্টি এবং প্রলয়, এই দুইয়ের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। যেমন জন্ম আর মৃত্যু। কাজী নজরুল, এমনকী যখন 'সৃষ্টিসুখের উল্লাসে' মগ্ন, তখনও কল্পনা করছেন, 'ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে, চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে'। আরও লিখেছেন : 'ফুলল সাগর দুললো আকাশ ছুটলো বাতাস/ গগন ফাটে চক্র ছোটে পিনাকপাণির শূল আসে'। প্রলয়ের পর ধ্বংসস্তূপ থেকে আবার নতুন সৃষ্টি জেগে উঠবে, বর্তমান পৃথিবীর সব কালিমা ধুয়ে মুছে যাবে, এমন একটা ভাবনাও স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে আসে।

তাই বোধহয় কয়েক বছর পরে পরেই গুজব শোনা যায়, মহাপ্রলয় এই এল বলে। ২০০০ সালে সহস্রাব্দের অন্তিমে শোনা গিয়েছিল, পৃথিবীর শেষ দিন ঘনায়মান। মধ্যযুগের এক পাদ্রি নস্ট্রাডামুস-এর লেখা বই নিয়ে অনেক দিন ধরে টানাটানি চলেছে। ভদ্রলোক এমন হেঁয়ালি ভাষায় তাঁর বই লিখে গিয়েছেন যে তার কোনও অর্থবহ পাঠোদ্ধার করাই মুশকিল। তবু শোনা যায়, তাঁর বইয়ের সব ভবিষ্যদ্বাণীই নাকি ফলেছে, মহাপ্রলয়ের গণনাও সত্য হতে বাধ্য।

কয়েক বছর যাবৎ নতুন একটা হুজুগ উঠেছে। ২০১২ সালের একুশে ডিসেম্বর নাকি একটা প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটবে। বর্তমান যুগ শেষ হয়ে নতুন পৃথিবীতে দেখা দেবে নতুন প্রভাত। শুধু তাই নয়, প্রলয় নিয়ে এমন প্রলাপের সুবাদে একদল লোক রীতিমতো ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। বই থেকে শুরু করে মায় হলিউডের সিনেমা পর্যন্ত বানানো হচ্ছে এই গুজবের ওপর ভিত্তি করে। পৃথিবীর অন্তিম লগ্ন ঘনিয়ে না এলেও, এটা যে ঘোর কলিকাল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এই আসন্ন শেষ লগ্নের কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে, ওই দিন সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলো একটা রেখায় এসে দাঁড়াবে। তার ফলে নাকি সৌরমণ্ডলে, সূর্যে এবং পৃথিবীতে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে যাবে। গ্রহদের সম্মিলিত আকর্ষণ এক বিপর্যয় ঘটাবে।

প্রথমত, এই এক রেখায় এসে দাঁড়ানোর গল্পটাই ভুল।

সমুদ্রের নীচে থেকে পাওয়া ভারী লোহা, নক্ষত্রের ছাই

টুকরোটা নিশ্চয় কোনও নক্ষত্রের ভস্ম, যেটা ছিটকে এসে পড়েছে এখানে। শুধু একটা মাত্র টুকরোর মধ্যে নয়, সমুদ্রের নীচে পুরো একটা তল জুড়ে এই ভারী লোহার ছড়াছড়ি। আর এই তলের গভীরতা থেকে তার বয়স নির্ধারণ করা যায়।

দ্বিতীয়ত, যদি এক রেখায় এসেও দাঁড়ায়, তবু পৃথিবীর ওপর মহাকর্ষের তেমন কোনো হেরফের ঘটত না। স্কুলে শেখা নিউটনের নিয়ম মেনে মহাকর্ষের তেমন কোনও হেরফের ঘটত না। স্কুলে শেখা পৃথিবীর ওপর মহাকর্ষের অঙ্কটা কষলে দেখা যাবে, পৃথিবীর ওপর সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতির প্রভাব সূর্যের তুলনায় হাজার ভাগেরও কম। সৌরমণ্ডলে গ্রহগুলোর ভর সূর্যের তুলনায় এত নগণ্য যে, মহাকর্ষের ব্যাপারে তাদের বিশেষ কোনও প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই, যদি না তারা খুব পাশাপাশি থাকে— যেমনটা হয় পৃথিবী আর চাঁদের ক্ষেত্রে। আমরা জানি চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীতে জোয়ার-ভাঁটা হয়। কিন্তু খুব ভারী না হলে আর খুব কাছে না থাকলে সৌরমণ্ডলের একটা বস্তু অন্য কোনও কিছুর ওপর খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারে না। আবার শোনা গেছে, ওইদিন সূর্য আর পৃথিবী আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রের সঙ্গে এক রেখায় দাঁড়াবে। এটাও গাঁজাখুরি, এবং হলেও তার কোনও প্রভাব পড়ার কথা নয়।

পৃথিবীতে প্রাণীর সংখ্যা ছয় কোটি বছর অন্তর হঠাৎ করে কমে গিয়েছে। প্রাণের বৈচিত্র্য কমে আসা কোনও বড় পরিবর্তনের দিকেই ইঙ্গিত করে। অবশ্য তারপর আবার ধীরে ধীরে সেই সংখ্যা বেড়েছে।

কিন্তু তা বলে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই যে অন্য কোনও মহাজাগতিক কারণে পৃথিবীতে প্রলয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে পারে না। গ্রহ ছাড়াও সৌরমণ্ডলের অন্য অনেক বাসিন্দা রয়েছে যাদের কক্ষপথ পৃথিবীর গা ঘেঁসে যেতে পারে, এমনকী ধাক্কাও লাগতে পারে। মহাকর্ষের অমোঘ নিয়মেই গ্রহ-উপগ্রহদের ছন্দোবদ্ধ গানে মাঝেমাঝে তাল কেটে যেতে পারে। লয় কেটে গিয়ে পৃথিবীতে আসতে পারে প্রলয়। গ্রহ-উপগ্রহ ছাড়াও সৌরমণ্ডলে রয়েছে পাথুরে গ্রহাণু (অ্যাস্টেরয়েড) আর বরফে মোড়া ধূমকেতুর দল। সৌরমণ্ডলের জন্মমুহূর্ত থেকেই এরা রয়েছে। এদের পরস্পরের মধ্যে ধাক্কা এবং জোড়া লেগেই তো সৌরমণ্ডলে গ্রহ-উপগ্রহ তৈরি হয়েছে। শেষ অবধি যে সব টুকরো বাকি থেকে গিয়েছিল তারা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। সৌরমণ্ডলের জন্মলগ্নের তুলনায় এগুলির সংখ্যা এখন অনেক কম, কিন্তু এখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। সাধারণত নিজেদের কক্ষপথেই ঘোরে এই জিনিসগুলো, তবে মাঝে মাঝে বড় গ্রহগুলোর আকর্ষণে তারা কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ে।

এদের যে কোনওটার সঙ্গে পৃথিবীর ধাক্কা লাগতে পারে। ছোটখাটোগুলো প্রায় সব সময় পৃথিবীতে এসে পড়ছে, যাকে আমরা উল্কাপাত বলি। কোনও উল্কা আয়তনে বড় হলে ভীষণ কাণ্ড ঘটতে পারে। নজরুলের কবিতায় যেমন পড়েছি, এই সব ধূমকেতু আর উল্কার জন্য তখন সৃষ্টি রসাতলে যেতে পারে।

পৃথিবার ইতিহাসে এমন ধাক্কা অনেকবার লেগেছে। পৃথিবীর জন্মের পরে পরেই একবার মঙ্গলের মতো বড় একটা জিনিসের ধাক্কায় পৃথিবীর গায়ের বেশ কিছু অংশ আকাশে ছিটকে পড়েছিল। পরে সেই ছিটকে পড়া টুকরোগুলো মহাকর্ষের দৌলতে জোড়া লেগে জন্ম নিয়েছিল আমাদের চাঁদ। এমন বড় মাপের না হলেও আরও বেশ কয়েকবার পৃথিবীর ঘাড়ে রদ্দা পড়েছে। প্রায় সাত কোটি বছর আগে একটা বিশাল উল্কা পড়ার পর আকাশ-বাতাস ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। অন্ধকারে সূর্যের আলোর অভাবে সৃষ্টি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল প্রায়। কেউ কেউ মনে করছেন তার প্রভাবেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ডাইনোসরের মতো বড় প্রাণীগুলো। কিন্তু বেঁচে গিয়েছিল ছোট ছোট প্রাণীরা। তেমন বিশাল না হলেও, গত শতাব্দিতেই একটা মোটামুটি বড় উল্কা এসে পড়েছিল সাইবেরিয়ার জঙ্গলে, টুঙ্গুস্কা-য়। সুদূর মস্কো থেকেও তার আওয়াজ শোনা গিয়েছিল, আলো দেখা গিয়েছিল। ঝলসে গিয়েছিল জঙ্গলের এক বিস্তৃত অঞ্চল—যেন উল্কাটা পৃথিবীর গায়ে উল্কি কেটে গেছে।

এরকমটা যে আবার হবে না সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এমন মহাজাগতিক ধাক্কা থেকে যে ধরনের প্রলয় আসতে পারে, সেটা নিয়েও সম্প্রতি অনেক লেখা হয়েছে, সিনেমাও বানানো হয়েছে। যদি কোনও বস্তুপিণ্ড পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে তাহলে আগেভাগে তার আভাস কী করে পাওয়া যেতে পারে সেই নিয়ে জল্পনাকল্পনা হয়েছে। খুব কাছে না এলে এদের ক্ষীণ আলো শক্তিশালী দূরবিন দিয়েও দেখা অসম্ভব। পৃথিবীর দিকে ধাওয়া করা বস্তুপিণ্ডের গতিপথ কীভাবে পাল্টানো যেতে পারে তা নিয়েও বিস্তর আলোচনা এবং বিতর্ক হচ্ছে, আজ হোক বা কাল, আমরা হয়তো একদিন এই বিপদ এড়ানোর উপায় আয়ত্ত করতে পারব।

তবে এ ছাড়াও আরও এক ধরনের মহাজাগতিক কারণে পৃথিবীতে প্রলয় হতে পারে যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া হয়তো অসম্ভব হবে। সৌরমণ্ডলের অন্ধকার অঞ্চল থেকে ছুটে আসা কোনও গ্রহাণু বা ধূমকেতু নয়, সৌরমণ্ডলের বাইরে সূর্যের প্রতিবেশী নক্ষত্রগুলোর জন্যও পৃথিবীতে মারাত্মক কাণ্ড ঘটতে পারে।

এমনও হতে পারে যে, এইরকম ঘটনা ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে কয়েকবার ঘটেছে। কয়েকবার না হলেও অন্তত একবার হয়েছিল বলে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন। কয়েক বছর আগে বিজ্ঞানীরা প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় সেই ঘটনার একটা প্রত্যক্ষ চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন। অন্য নক্ষত্র থেকে ছিটকে আসা এক টুকরো অদ্ভুত ধরনের লোহা। সাধারণ লোহা নয়, এমন এক ধরনের লোহা যা তৈরি হয় শুধু নক্ষত্রের চিতায়।

একটু খোলসা করে বলা যাক। নক্ষত্রের যেমন জন্ম হয়, তেমন নক্ষত্রের জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে নক্ষত্র হিসেবে তার 'আয়ু'ও ফুরিয়ে আসে। নক্ষত্রের মধ্যে আলো তৈরি হয় তার ভেতরের পদার্থের মধ্যে পারমাণবিক বিক্রিয়ার ফলে। সূর্যের

যদি মহাজাগতিক রশ্মি থেকে মেঘ তৈরি হয়, তাহলে এই রশ্মি বেড়ে গেলে আকাশ অস্বাভাবিকভাবে মেঘলা হয়ে পড়বে। তখন সূর্যের আলো পৌঁছতে পারবে না পৃথিবীর গায়ে। প্রথমে মারা পড়বে গাছগাছালি, তারপর উদ্ভিদভোজী প্রাণী এবং শেষে অন্যান্য সব প্রাণী। তা ছাড়া মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে আকাশে ওজোন অণু ভেঙে গিয়ে ওজোন-স্তরের ক্ষতি করবে।

কথা ধরা যাক। তার কেন্দ্রে চারটে প্রোটন মিলে একটা হিলিয়াম কণা তৈরি হয়, এবং সেই সঙ্গে কিছু শক্তি আলোর আকারে বেরিয়ে আসে। অবশ্য নক্ষত্রের ভেতরকার তাপে হিলিয়াম পরমাণু তার ইলেকট্রনগুলোকে ধরে রাখতে পারে না, শুধু হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস তৈরি হয়। মোট কথা আমরা বলতে পারি যে, এ ক্ষেত্রে প্রোটন বা হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস হচ্ছে এক ধরনের 'জ্বালানি', যার বিক্রিয়ার ফলে তৈরি হচ্ছে আলো। এই জ্বালানিস্বরূপ হাইড্রোজেন ফুরিয়ে গেলে সূর্য হবে জরাগ্রস্ত। প্রথমে অস্বাভাবিকভাবে ফুলে উঠে তারপর একটা বামন নক্ষত্র হয়ে চিরকাল ধুঁকবে।

সূর্যের চেয়ে অনেক ভারী নক্ষত্রের ব্যাপারটা একটু অন্য রকম; তাদের কপালে শান্তি নেই। এদের ভেতরকার তাপমাত্রা সূর্যের চেয়ে বেশি। সেখানে হিলিয়াম তৈরি করেই যবনিকা পতন হবে না; এর চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে যাবে। হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস সেখানে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তৈরি হবে আরও বড় পরমাণু-কেন্দ্র, যেমন কার্বন। তারপর একের পর এক জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হতে থাকবে কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন। এইভাবে নক্ষত্রের গর্ভে তৈরি হবে সালফার, ক্যালসিয়াম, লোহার মতো পদার্থ।

কিন্তু এক সময় এমন অবস্থা আসবে যে পারমাণবিক বিক্রিয়া থেকে আর শক্তি তৈরি করা সম্ভব হবে না। তখন একটা বিধ্বংসী বিস্ফোরণে সমস্ত নক্ষত্রটা ফেটে পড়বে। তার ভেতরে সঞ্চিত পদার্থসমূহ বাইরে ছিটকে পড়বে। আর ওই বিস্ফোরণের ফলে কিছু নতুন ধরনের পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটবে এবং তৈরি হবে আরও নতুন কিছু পদার্থ।

এই নক্ষত্র-মৃত্যুর বিস্ফোরণ, যাকে বলে সুপারনোভা, এর ফলে সাধারণ লোহার একটা নতুন সংস্করণ তৈরি হয়। সাধারণ লোহার পরমাণুর কেন্দ্রে ছাব্বিশটা প্রোটন থাকে, আর থাকে ত্রিশটি নিউট্রন। এই নতুন ধরনের লোহা তৈরির সময় তার কেন্দ্রে চারটে অতিরিক্ত প্রোটন ঢুকে পড়ে, তাই এর ওজন হয় বেশি। যেমন ভারী জল, যাকে পারমাণবিক শক্তির জন্য ব্যবহার করা হয়, তার ওজন সাধারণ জলের তুলনায় বেশি। এই কিম্ভূত লোহাকে তাই ভারী লোহা বলা যেতে পারে।

এই ভারী লোহা আবার চিরস্থায়ী নয়। এই লোহা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়, ফলে তার একাংশ পরিণত হয় সাধারণ লোহায়। অর্থাৎ এই ভারী লোহা রেডিয়াম বা ইউরেনিয়ামের মতো তেজস্ক্রিয়। এই সব পদার্থের পরমাণু থেকে অহরহ পদার্থকণা বেরিয়ে আসে, এবং পরমাণুটা ধীরে ধীরে বদলায়। তাই যদি এই রকম এক টুকরো লোহা পাওয়া যায় যার একাংশ হল ভারী লোহা, তাহলে সহজেই অঙ্ক কষে বলে দেওয়া যায় সেটা কত বছরের পুরনো, অর্থাৎ কত বছর ধরে তার রূপান্তর ঘটেছে।

কিন্তু ভারী লোহার ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি কথা হল এই ধরনের লোহা সাধারণত প্রকৃতিতে তৈরি হয় না। শুধু সুপারনোভার বিস্ফোরণেই এই লোহা তৈরি হতে পারে।

১৯৯৯ সালে মিউনিখের টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানী ক্লাউস খ্‌নি এবং তাঁর কয়েকজন সহযোগী প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় এক টুকরো লোহা খুঁজে পেয়েছিলেন যার মধ্যে তেজস্ক্রিয়, ভারী লোহার অংশ ছিল অস্বাভাবিকভাবে বেশি। অর্থাৎ এর উৎস পৃথিবী বা সৌরমণ্ডলের কোথাও নয়। এই টুকরোটা নিশ্চয় কোনও নক্ষত্রের ভস্ম, যেটা ছিটকে এসে পড়েছে এখানে। শুধু একটা মাত্র টুকরোর মধ্যে নয়, সমুদ্রের নীচে পুরো একটা তল জুড়ে এই ভারী লোহার ছড়াছড়ি। আর এই তলের গভীরতা থেকে তার বয়স নির্ধারণ করা যায়। বিজ্ঞানীরা বলেছেন এটা প্রায় ত্রিশ লক্ষ বছর পুরনো। অর্থাৎ ত্রিশ লক্ষ বছর আগে কোনও প্রতিবেশী নক্ষত্রের মৃত্যুর সময় তার ছাইভস্ম এসে পড়েছিল পৃথিবীতে।

এই ভারী লোহার স্তর কতটুকু পুরু, অর্থাৎ পৃথিবীর গায়ে এসে পড়া মোট ভারী লোহার পরিমাণ কতটুকু, এবং তার সঙ্গে একটা সুপারনোভায় কত ভারী লোহা তৈরি হতে পারে, তার তুলনা করে সুপারনোভাটা কত দূরে ছিল তার একটা আন্দাজ করা যায়। বিজ্ঞানীদের মতে এই সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটেছিল ত্রিশ থেকে তিনশো আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যে।

নক্ষত্রের দুনিয়ায় এই দূরত্ব এমন কিছু নয়— সৌরমণ্ডলের কাছেপিঠেই বলা যায়। সেই সুপারনোভা নিশ্চয় আদিম পৃথিবীর আকাশে জ্বলজ্বল করেছিল। দিনের আকাশেও উজ্জ্বল দেখা গিয়েছিল তাকে। আদিম মানুষেরা হয়তো অবাক হয়েছিল আকাশে হঠাৎ একটা তারাকে অস্বাভাবিকভাবে জ্বলে উঠতে দেখে। (কে জানে তাদের মধ্যে কেউ কবি ছিল কি না। হয়তো কেউ তাদের ভাষায় জীবনানন্দের মতো ভেবেছিল: 'নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়, নক্ষত্রের মতন হৃদয়/ পড়িতেছে ঝরে'।)

সেই সময় পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল? মজার কথা হল, ওই সময়ে পৃথিবীর আবহাওয়ায় একটা বেশ বড় রকমের পরিবর্তন এসেছিল। উত্তর গোলার্ধে শুরু হয়েছিল হিমবাহের যুগ। আফ্রিকার আবহাওয়া শুকনো হয়ে গিয়ে বনাঞ্চলের জায়গায় দেখা দিয়েছিল নিষ্পাদপ প্রান্তর, বা 'সাভানা'। এর সঙ্গে আদিম মানুষের বিবর্তনের একটা যোগ আছে বলে অনেকে মনে করেন। বিজ্ঞানীদের মতে এই সাভানার আবির্ভাবের জন্য চারপেয়ে মানুষ গাছ থেকে নেমে মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। ধীরে ধীরে এসেছিল দু'-পেয়ে মানুষ। ওই সময় 'অস্ট্রালোপিথেকাস' মানুষ দেখা দেয়। এদের মধ্যে যে আদিম মানবী 'লুসি'-র কঙ্কাল পাওয়া গেছে, সেও

কর্কট নীহারিকা। ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে ৬৫০০ আলোকবর্ষ দূরের এক নক্ষত্রে সুপারনোভা বিস্ফোরণের পর ছড়িয়ে পড়া অবশেষ

যদি মহাজাগতিক রশ্মির কমবেশি হওয়ার সঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্পর্ক থাকে তাহলে সূর্যের গায়ে ঝড় ওঠার সঙ্গেও পৃথিবীর আবহাওয়ার সম্পর্ক থাকা উচিত।

গ্রহ ছাড়াও সৌরমণ্ডলের অন্য অনেক বাসিন্দা রয়েছে যাদের কক্ষপথ পৃথিবীর গা ঘেঁসে যেতে পারে, এমনকী ধাক্কাও লাগতে পারে। মহাকর্ষের অমোঘ নিয়মেই গ্রহ-উপগ্রহদের ছন্দোবদ্ধ গানে মাঝেমাঝে তাল কেটে যেতে পারে। লয় কেটে গিয়ে পৃথিবীতে আসতে পারে প্রলয়। গ্রহ-উপগ্রহ ছাড়াও সৌরমণ্ডলে রয়েছে পাথুরে গ্রহাণু (অ্যাস্টেরয়েড) আর বরফে মোড়া ধূমকেতুর দল।

প্রায় ত্রিশ লক্ষ বছর আগে জীবিত ছিল।

মনে প্রশ্ন জাগে এই সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে কি ওই সুপারনোভার কোনও যোগসূত্র আছে? এমন কি হতে পারে যে, কোনও প্রতিবেশী নক্ষত্রের মৃত্যুর জন্যই মানুষের বিবর্তনের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্ভব হয়েছিল?

এক দল বিজ্ঞানীর মতে, এমন একটা যোগাযোগ সত্যিই থাকতে পারে। সুপারনোভার বিস্ফোরণের জন্য তার চারপাশের গ্যাসে যে ধাক্কা লাগে তার ফলে সেখানকার কিছু পদার্থকণা খুব শক্তিশালী হয়ে পড়তে পারে। এই পদার্থকণাগুলো তখন ঝাঁকে ঝাঁকে ছায়াপথ জুড়ে চলতে থাকে বুলেটের মতো। আমাদের পৃথিবীর আকাশে এই শক্তিশালী কণা এসে হরদম আঘাত করছে— এর নাম 'কসমিক রে', বা মহাজাগতিক রশ্মি। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর নাম দিয়েছিলেন 'আকস্মিক রশ্মি'।)

গত শতাব্দিতেই একটা মোটামুটি বড় উল্কা এসে পড়েছিল সাইবেরিয়ার জঙ্গলে, টুঙ্গুস্কা-য়। সুদূর মস্কো থেকেও তার আওয়াজ শোনা গিয়েছিল, আলো দেখা গিয়েছিল।

কয়েকজন বিজ্ঞানীর মতে পৃথিবীতে মহাজাগতিক রশ্মির পরিমাণ বেড়ে গেলে বায়ুমণ্ডলে বেশ বড় রকমের পরিবর্তন হতে পারে। যেমন, এর ফলে বাতাসে মেঘের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। মেঘ কী করে তৈরি হয়? বাতাসের জলীয় বাষ্প থেকে মেঘ তৈরি হওয়ার জন্য প্রয়োজন অ্যারোসোলের (বাতাসে ভাসমান অতি সূক্ষ্ম পদার্থকণা, যেমন মিহি ধুলো, ধোঁয়া ইত্যাদির) মতো সূক্ষ্ম পদার্থের। এমন হতে পারে যে, মহাজাগতিক রশ্মির জন্য কিছু অতিরিক্ত অ্যারোসোল তৈরি হতে পারে। মহাজাগতিক রশ্মির শক্তিশালী পদার্থকণাগুলো বাতাসের মধ্য দিয়ে চলার সময় চারপাশের অণুগুলো থেকে ইলেকট্রন ছিনিয়ে নেয়। তার জন্য অণুগুলোর মধ্যে বৈদ্যুতিক চার্জ সৃষ্টি হয়। আর বৈদ্যুতিক চার্জ থাকলে তার গায়ে অন্য অণু লেগে অ্যারোসোল কণা তৈরি হতে পারে।

এ নিয়ে অবশ্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। আমাদের সূর্যের গায়ে যে ঝড় ওঠে তার ধাক্কাতেও কিছু পরিমাণে মহাজাগতিক রশ্মি তৈরি হয়। যদি মহাজাগতিক রশ্মির কমবেশি হওয়ার সঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্পর্ক থাকে তাহলে সূর্যের গায়ে ঝড় ওঠার সঙ্গেও পৃথিবীর আবহাওয়ার সম্পর্ক থাকা উচিত। সত্যিই এমন কোনও চিহ্ন আছে কি না এই নিয়ে বেশ বড় বিতর্ক চলছে। কয়েকজন বিজ্ঞানীর মতে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাওয়া তথ্যে এই রকম একটা সম্পর্ক দেখা গেছে। এছাড়া, জেনিভার বিখ্যাত সার্ন (CERN) পরীক্ষাগারে, যেখানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থকণা নিয়ে পরীক্ষা করা হয়, সেখানে সম্প্রতি CLOUD নামে একটা পরীক্ষা করা হয়েছে মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে অ্যারোসোল তৈরির কোনও সম্পর্ক আছে কি না খতিয়ে দেখার জন্য। এই পরীক্ষার প্রাথমিক ফল থেকে দেখা গেছে যে, হয়তো একটা সম্পর্ক সত্যিই আছে, যদিও যোগসূত্রটা খুব একটা পরিষ্কার নয়।

যদি মহাজাগতিক রশ্মি থেকে মেঘ তৈরি হয়, তাহলে এই রশ্মি বেড়ে গেলে আকাশ অস্বাভাবিকভাবে মেঘলা হয়ে পড়বে। তখন সূর্যের আলো পৌঁছতে পারবে না পৃথিবীর গায়ে। প্রথমে মারা পড়বে গাছগাছালি, তারপর উদ্ভিদভোজী প্রাণী এবং শেষে অন্যান্য সব প্রাণী। তা ছাড়া মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে আকাশে ওজোন অণু ভেঙে গিয়ে ওজোন-স্তরের ক্ষতি করবে। শক্তিশালী পদার্থকণার জন্য বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়, যা ওজোনের পক্ষে ক্ষতিকারক। তার ফলে সূর্যের অতিবেগুনি আলো বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ঢুকে প্রাণের ক্ষতি করতে পারে। কারণ তার ফলে কোষের মধ্যে ডি এন এ-র পরিবর্তন ঘটতে পারে (যাকে বলে মিউটেশন)। অবশ্য এই মিউটেশনের জন্য নতুন প্রজাতির প্রাণীও দেখা দিতে পারে।

আবহাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আজকাল অনেক জল ঘোলা হচ্ছে। এই ধরনের গবেষণায় আজকাল বিজ্ঞানীদের নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করাটা কঠিন। তাই এই গবেষণার কোনও সদুত্তর পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। বর্তমানে পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য মানুষ কতটুকু দায়ী আর কতটুকু মহাজাগতিক কারণে ঘটেছে, এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করা সহজ কথা নয়। তবে যদি একটা যোগসূত্র থাকে তাহলে এই কথাটা ভাবতে শিহরন জাগে যে, হয়তো আকাশের কোনও নক্ষত্রের মৃত্যু পৃথিবীতে তার চিহ্ন রেখে গেছে। শুধু লোহার টুকরো নয়, মানুষের বিবর্তনেও হয়তো তার ছাপ রেখে গেছে।

এবং শুধু একবার নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে এ রকম ঘটনা হয়তো বেশ কয়েকবার ঘটেছে। সৌরমণ্ডলের চারপাশে এক

অতিকায় নানা অ্যাস্টেরয়েডের সংঘাত পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকগুলি ছাপ রেখে গেছে। (বাঁদিকে) টুঙ্গুস্কায় বিধ্বস্ত অরণ্যের একাংশ

বার নজর দিলে দেখা যায় যে, আমরা বেলুনের মতো হালকা গ্যাসের একটা বুদবুদের মধ্যে রয়েছি। চারিদিকে ঘন গ্যাসের আবরণ, মধ্যিখানে এই হাল্কা বুদবুদ। এর পেছনেও একটা সুপারনোভার হাত রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন—হয়তো প্রকাণ্ড বিস্ফোরণে গ্যাস সরে গিয়ে এই বুদ্বুদ তৈরি হয়েছে। এবং তার একটা সাক্ষাৎ প্রমাণ রয়েছে। সুপারনোভার পর ধ্বংস হয়ে যাওয়া নক্ষত্রের গর্ভে সাধারণত একটা বনবন করে ঘুরতে থাকা নতুন নক্ষত্র জন্ম নেয়, এদের নাম পালসার নক্ষত্র। এমন একটা পালসার সৌরমণ্ডলের খুব কাছে খুঁজে পাওয়া গেছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'গেমিংগা'। বিজ্ঞানীদের মতে এই সুপারনোভা ঘটেছিল প্রায় তিন লক্ষ বছর আগে।

গেমিংগার সুপারনোভার জন্য কি পৃথিবীতে কোনও প্রভাব পড়েছিল? গেমিংগার দূরত্ব অবশ্য পাঁচশো আলোকবর্ষেরও বেশি। এত দূরের মহাজাগতিক রশ্মি হয়তো পৃথিবীর ওপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। হয়তো জোর বেঁচে গিয়েছিল তখনকার দিনের মানুষ।

সুপারনোভা ছাড়াও মহাজাগতিক রশ্মি তৈরি হতে পারে। গ্যাসের ওপর একটা বড়সড় ধাক্কা, যাকে বলে একটা বিরাশি সিক্কার চড় পড়লেই এমন পদার্থকণা দেখা দেয়। এই ধাক্কার কারণ সুপারনোভার বিস্ফোরণ না হয়ে অন্য কিছুও হতে পারে। যেমন শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী কোনও যুদ্ধবিমান আকাশে উড়ে গেলে তার চারিদিকের গ্যাসের ওপর একটা সাংঘাতিক ধাক্কা পড়ে। এই 'সনিক বুম' অনেক দূর থেকে শোনা যায়। এই ধরনের একটা অবস্থা আমাদের গ্যালাক্সির মধ্যেও হতে পারে। সূর্য হল আমাদের গ্যালাক্সি 'ছায়াপথ'-এর বাসিন্দা। এবং এই ছায়াপথ তুমুল বেগে একটা গ্যালাক্সিপুঞ্জের দিকে ধেয়ে চলেছে। তার গতিবেগ শুনলে ভিরমি খেতে হয়: সেকেন্ডে প্রায় দু'শো কিলোমিটার। অর্থাৎ এমন গতির কোনও ট্রেনে উঠলে সাত সেকেন্ডেই দিল্লি-কলকাতার দূরত্ব পার করা যাবে।

এই দুরন্ত বেগে সাঁইসাঁই করে চলার জন্য আমাদের ছায়াপথের অন্তর্বর্তী গ্যাসের ওপর বিশাল চাপ পড়ছে। আমাদের ছায়াপথের আকারটা হল একটা চাকতির মতো, যার মধ্যে কয়েকটা চক্রের মতো প্যাঁচানো 'হাত' রয়েছে। আর আমাদের সূর্য এই ছায়াপথের বাইরের দিকের একটা অঞ্চলের বাসিন্দা। ছায়াপথের চাকতিটার একদিক একটা প্রতিবেশী গ্যালাক্সিপুঞ্জের দিকে মুখ করে আছে। এবং সেই দিকে মহাকর্ষের জোরে প্রচণ্ড গতিতে চলেছে। আলোচনার সুবিধার্থে এই দিকটাকে 'ওপর' দিক নাম দেওয়া যাক, যদিও মহাকাশে ওপর-নীচ বলে আসলে কিছু নেই। যাই হোক, এই দিকে ছায়াপথের দ্রুতবেগে ছুটে যাওয়ার জন্য চাকতিটার 'ওপর'দিককার গ্যাসে প্রচুর পরিমাণে মহাজাগতিক রশ্মি তৈরি হচ্ছে।

এবার এই ছায়াপথের চাকতির মধ্যে সূর্যের ঘোরার কথা ভাবা যাক। সূর্য এই চাকতিটার চারিদিকে তার কক্ষপথে ঘুরছে, তবে সব সময় চাকতিটা যে-তলে ঘুরছে সেই তলে নয়—একটু আধটু ওপর-নীচ করতে করতে চলে সে। মেলায় যেমন ঘোড়ার নাগরদোলার ঘোড়াগুলো ঘুরতে ঘুরতে ওঠানামা করে, ঠিক তেমন। তাহলে এই রকম ওপর-নীচ ওঠানামা করে চক্কর লাগাতে লাগাতে যখন পৃথিবী ছায়াপথের চাকতির 'ওপরে' গিয়ে ঠেকবে তখন তার আকাশে প্রচুর পরিমাণে মহাজাগতিক রশ্মি এসে পড়া স্বাভাবিক।

এমন ঘটনা কত বছর অন্তর হওয়া উচিত? আমেরিকার কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানী, অ্যাড্রিয়ান মেলট্ এবং মিখাইল মেডভিডেভ্ ২০০৭ সালে অঙ্ক কষে জানিয়েছেন, প্রায় ছয় কোটি বছর পর পর সূর্য তথা পৃথিবী ছায়াপথের 'ওপর' দিকটা ছুঁয়ে আসছে। অর্থাৎ প্রায় ছয় কোটি বছর অন্তর পৃথিবীর আকাশে মহাজাগতিক রশ্মির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কথা। তখন এই মহাজাগতিক রশ্মি-স্নাত পৃথিবীতে কি কোনও পরিবর্তন আসে?

এই দুই বিজ্ঞানীর মতে এর সঙ্গে পৃথিবীর আবহাওয়ার একটা গভীর সম্পর্ক থাকতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বিজ্ঞানী রিচার্ড ম্যুলার এবং রবার্ট রোড অতীতের জীবাশ্মের সংখ্যার ইতিহাসে একটা অদ্ভুত চিহ্ন লক্ষ করেছিলেন। 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তাঁরা জানিয়েছিলেন যে, গত পঞ্চাশ কোটি বছরের জীবাশ্মের

ছায়াপথ গ্যালাক্সিতে সূর্যের ঢেউখেলানো গতিপথ (সবুজ রেখা)

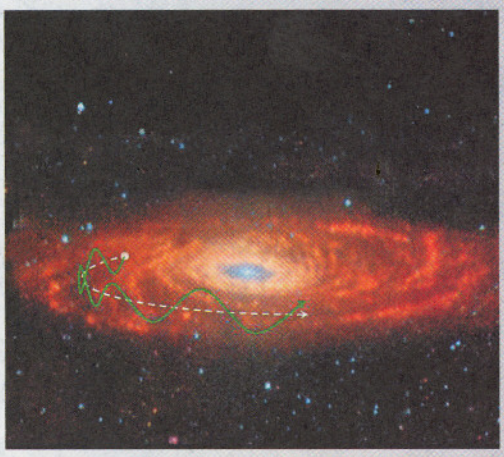

যদি কোনও বস্তুপিণ্ড পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে তাহলে আগেভাগে তার আভাস কী করে পাওয়া যেতে পারে সেই নিয়ে জল্পনাকল্পনা হয়েছে। খুব কাছে না এলে এদের ক্ষীণ আলো শক্তিশালী দূরবিন দিয়েও দেখা অসম্ভব।

সংখ্যার মধ্যে প্রতি ছয় কোটি বছর অন্তর একটা ধ্বংসের চিহ্ন রয়েছে। প্রাণের বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা পর্যায়ক্রম লক্ষ করা যায়, যেটা প্রায় ছয় কোটি বছর অন্তর পৃথিবীর প্রজাতির সংখ্যার ওপর প্রভাব ফেলেছে।

অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রাণীর সংখ্যা ছয় কোটি বছর অন্তর হঠাৎ করে কমে গিয়েছে। প্রাণের বৈচিত্র্য কমে আসা কোনও বড় পরিবর্তনের দিকেই ইঙ্গিত করে। অবশ্য তারপর আবার ধীরে ধীরে সেই সংখ্যা বেড়েছে। তার পর আবার ছয় কোটি বছর পর নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে অনেক প্রাণী। যেন উল্কা-ধূমকেতুর ধাক্কা ছাড়াও প্রতি ছয় কোটি বছর পর এক-একবার ছোটখাটো প্রলয় এসেছে। এইভাবে নিয়ম করে, প্রায় ঘড়ি ধরে আসা প্রলয়ের পেছনে নিশ্চয় কোনও গূঢ় কারণ রয়েছে। তাই যখন এই প্রলয়গুলোর সময়ের সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মির কমবেশি হওয়ার সময়ের অঙ্কটা মিলে যায়, তখন মনে বিস্ময় জাগে।

এই দুইয়ের মধ্যে—ছায়াপথে সৌরমণ্ডলের ওঠানামা আর পৃথিবীতে প্রাণের বৈচিত্র্যে কমবেশি হওয়া—এদের মধ্যে কি কোনও কার্য-কারণ সম্বন্ধ রয়েছে? এই নিয়ে এই মুহূর্তে বিজ্ঞানী মহলে খুব তর্কবিতর্ক চলছে। কয়েকজন বিজ্ঞানীর মতে এর কারণ মহাজাগতিক কোনও ঘটনা নয়, পৃথিবীর ভেতরকার পদার্থের নড়াচড়ার জন্য নিয়ম করে আগ্নেয়গিরি উদ্গীরণ হতে পারে, যার ফলে আকাশ বাতাস অন্ধকার হয়ে আসতে পারে। তবে যদি এই সব প্রলয়কাণ্ডের সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মির যোগাযোগ থাকে তাহলে নতুন প্রজাতির আবির্ভাবের ব্যাপারটাও বোঝা যায়। প্রাণের কোষের মধ্যে মিউটেশন ঘটানোর জন্য নতুন প্রজাতি দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। সেই ক্ষেত্রে মহাজাগতিক রশ্মি শুধু প্রলয় নয়, নতুন সৃষ্টির সংবাদ নিয়েও আসতে পারে।

নক্ষত্রের যেমন জন্ম হয়, তেমন নক্ষত্রের জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে নক্ষত্র হিসেবে তার 'আয়ু'ও ফুরিয়ে আসে। নক্ষত্রের মধ্যে আলো তৈরি হয় তার ভেতরের পদার্থের মধ্যে পারমাণবিক বিক্রিয়ার ফলে।